The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXV, 2019 (pp. 131 - 140)
Published in December, 2023

ভারতীয় দর্শনে কর্মের ধারণা

রীতা রানী ধর*

প্রতিপাদ্যসার

ভারতীয় দর্শন বলতে ভারতবর্ষের সমগ্র তত্ত্বচিন্তাকেই বুঝায়। ভারতীয় দর্শন দু'শ্রেণিতে বিভক্ত। আস্তিক্যবাদী এবং নাস্তিক্যবাদী দর্শন। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা এবং বেদান্ত এই ছয়টি আস্তিক দর্শন আর বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাক, এই তিনটি নাস্তিক দর্শন। এই আস্তিক এবং নাস্তিক মিলে সমগ্র ভারতবর্ষের সর্বশ্রেণির চিন্তাবিদদের বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যা সম্পর্কে সমস্ত মতবাদই ভারতীয় দর্শন। এই দর্শনগুলোতে বিভিন্ন আলোচনা, সমালোচনা এবং মতবাদ ভারতীয় দার্শনিকদের উদার ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের অপূর্ব সত্যানুসন্ধান এবং বিচারনিষ্ঠার পরিচয় বহন করে। অতি প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু দার্শনিক মাধবাচার্যের "সর্বদর্শন সংগ্রহ" নামক এক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিকদের মতবাদ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি একজন বেদবিশ্বাসী দার্শনিক ছিলেন। ভারতের প্রতিটি দার্শনিক সম্প্রদায় আলোচনা পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রকাশপূর্বক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে তারপরেই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। কোন দার্শনিক নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে তার পূর্বের দার্শনিকের যুক্তিখণ্ডন করতেন এবং সবশেষে তিনি নিজস্ব যুক্তিতর্কের সাহায্যে তাঁর নিজ মতের প্রতিষ্ঠা করতেন। এভাবে ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের পারস্পরিক আলোচনার দ্বারাই ভারতের প্রতিটি দর্শনশাখা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এ কারণেই ভারতীয় দর্শন এত উদার এবং ব্যাপক। চার্বাক ব্যতীত প্রত্যেকটি ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ স্বীকৃত হয়েছে। কর্মের ফলভোগ করতেই হবে। কর্মফল কখনই নষ্ট হয় না। শুভ, অশুভ, পাপ, পুণ্য–– সবই কর্মফলের মধ্য দিয়ে সংরক্ষিত থাকে। কর্মবাদকে তাই নৈতিক মূল্যের সংরক্ষণ নিয়ম বলা হয়ে থাকে। আলোচ্য প্রবন্ধে "ভারতীয় দর্শনে কর্মের ধারণা" সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

*সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

কর্মের স্বরূপ বা সংজ্ঞা

কর্ম শব্দটি 'কৃ' ধাতু থেকে উৎপন্ন। 'কৃ' ধাতুর অর্থ কার্য করা, শারীরিক এবং মানসিক সব রকম কার্যই কর্ম। প্রত্যেক কর্মই নিজ নিজ ফল উৎপাদন করে। সব কর্মের ফল তিন প্রকার-ভাল, মন্দ এবং মিশ্র; কর্ম যে প্রকার, তার ফলও এর অনুরূপ হবে। জীব তার কর্মানুযায়ী ফল ভোগ করে। সৎকর্মের ফল পুণ্য এবং সুখ; অসৎ কর্মের ফল পাপ এবং দুঃখ। কর্মবাদকে বলা যেতে পারে নৈতিক কার্যকারণবাদ, কারণ থাকলেই যেমন কার্য, তেমন কর্ম থাকলেই কর্মফলভোগ। কোন জীবের পক্ষেই কর্মফলভোগকে এড়ান সম্ভব নয়। পুরুষ ও প্রকৃতি মিলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। এই সৃষ্টিতে পুরুষ কখনও পরিবর্তন হয় না। আর প্রকৃতি কখনও পরিবর্তনরহিত হয় না। যখন এই পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে তখন প্রকৃতির ক্রিয়া পুরুষের 'কর্ম' হয়ে দাঁড়ায় কারণ প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করলে তাদাত্ম্য নিবিড় ঐক্য ও অভেদ ঘটে যায়। তাদাত্ম্য হয়ে গেলে যেসব প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ পাওয়া যায় তাতে মমত্ব এসে যায় এবং সেই মমতার দরুন অপ্রাপ্ত বস্তুরও কামনা জাগে। এইভাবে যতদিন পর্যন্ত কামনা, মমতা ও তাদাত্ম্য থাকে, ততদিন যা কিছু পরিবর্তনস্বরূপ ক্রিয়া ঘটতে থাকে, সেগুলোর নাম 'কর্ম'।

ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ বা কর্ম নিয়ম বিধি

ভারতীয় দর্শন ও জীবন কর্মবাদের দ্বারা পরিচালিত। ভারতীয় দার্শনিকেরা কর্ম-নিয়মে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এখন প্রশ্ন দর্শনে কর্ম-নিয়ম বলতে কী? এই নিয়মের সহজ অর্থ হল, যে যেমন কর্ম করে, সে তেমন ফল পায় এবং কর্মকর্তাকে তার ভালো-মন্দ সব কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। কোন জীবের পক্ষেই কর্মফল ভোগ থেকে অব্যাহতি লাভ সম্ভব নয়। কর্মবাদ বা কর্ম-নিয়মকে নৈতিক কার্যক্রম বলা যেতে পারে। কারণ থাকলেই যেমন কার্য থাকে, তেমনি কর্ম থাকলেই কর্মফল ভোগ থাকবে। ভারতীয় দার্শনিকদের মতে যে সনাতন নৈতিক নিয়ম গ্রহ, নক্ষত্র, দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি বিশ্বের সমস্ত বস্তুকে পরিচালিত করে, সেই নিয়মে সাধারণভাবে 'কর্মবাদ' গড়ে উঠেছে। আদি যুগ থেকেই ভারতীয় মনীষীরা কর্ম-নিয়মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। ঋকবেদের ঋষি যে অখণ্ড নিয়মে কল্পনা করে ঋত নাম রেখেছিলেন, সেই ঋতই পরবর্তী কালের কর্মনিয়ম। অনিবার্য কার্যকরণ নিয়মের যেমন ব্যতিক্রম নেই এই কর্ম নিয়মেরও তেমনি ব্যতিক্রম নেই। কর্মনিয়মে বিশ্বাস ছাড়া মানুষের বিভিন্ন সুখ-দুঃখ ভোগের এবং প্রতিভা লাভের বৈষম্যকে সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। একই অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে এবং একই পরিবেশে লালিত-পালিত হয়েও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে কেউ সুখী, কেউ দুঃখী, কেউ প্রতিভাবান, আবার কেউ প্রতিভাহীন হয় কেন? এর ব্যাখ্যা একমাত্র 'কর্ম-নিয়মই' দিতে পারে। কর্ম-নিয়ম অনুসারে সৎকর্ম সুফল প্রদান করে, আর অসৎকর্ম কুফল প্রদান করে। আমাদের মনে করতে হবে, সুখী ব্যক্তির সুখ ভোগ তাঁর সৎকর্মের ফল, আর দুঃখী ব্যক্তির দুঃখ ভোগ তাঁর অসৎ কর্মেরই ফল। মানুষের সৎ এবং অসৎ উভয় প্রকার কর্মই এক অদৃশ্য শক্তি উৎপন্ন করে। এই শক্তি মানবের শুভ বা অশুভ কর্ম অনুসারে তাদের সুখ বা দুঃখ আনয়ন করে।

কর্মের প্রকারভেদ

জগতে প্রতি নিয়তই মানুষ কর্ম করছে। কর্ম দুভাগে বিভক্ত, যথা-সকাম কর্ম এবং নিষ্কাম কর্ম। ফল ভোগের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে কর্ম করা হয়, তা সকাম কর্ম আর ফল ভোগের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে যে কর্ম করা হয় তা নিষ্কাম কর্ম। সকাম কর্ম আনে মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও বন্ধন, আর নিষ্কাম কর্ম আনে মানুষের মুক্তি। মানুষের কর্মকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা– সঞ্চিত, আরব্ধ বা প্রারব্ধ এবং সঞ্চিয়মান কর্ম। যে কর্ম অতীতে

সম্পাদিত হয়েছে, কিন্তু এখনও ফল প্রসব করে নাই, সেই কর্মকে সঞ্চিত কর্ম বলা হয়। যে কর্ম ফল প্রসব করতে আরম্ভ করে সেই কর্মকে আরব্ধ বা প্রারব্ধ কর্ম বলা হয়। আর যে কর্ম বর্তমানে করা হয়েছে, কিন্তু ফল প্রসব করে নাই, সে কর্ম 'সঞ্চিয়মান' কর্ম। মানুষের বর্তমান দেহ ও সুখ-দুঃখ তার প্রারব্ধ কর্মেরই ফল। তাই অনেকের মতে, আমাদের জন্ম বর্তমান পরিস্থিতি এবং সুখ-দুঃখ সবই আমাদের কর্মের উপর নির্ভর করে।

কৃতকর্মের কর্মফল প্রদান

জৈন, ন্যায়, বৈশেষিক এবং মীমাংসা দার্শনিকদের মতে, কৃতকর্ম থেকে একপ্রকার শক্তি উৎপন্ন হয় এবং এই শক্তিই কর্মফল প্রদান করে। জৈন মতে, জীবের কৃতকর্ম থেকে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, সেই শক্তি প্রথমে ভাব কর্মরূপে আত্মায় প্রবৃত্তি বা কষায় উৎপন্ন করে এবং পরে দ্রব্য কর্মরূপে সূক্ষ্ম পুদ্‌গল পরমাণু সৃষ্টি করে জীবের কামনা শরীর গঠন করে। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, জীবের পাপ-পুণ্য যার মধ্যে সঞ্চিত থাকে তার নামই অদৃষ্ট। এই অদৃষ্টশক্তি অচেতন, এর নিজের কোন নিয়ন্ত্রণক্ষমতা নেই। সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এই অদৃষ্টশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, জীবের পাপ-পূণ্যের বিচার করে তার ফল প্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন। মীমাংসকদের মতে, বেদবিহিত কর্মই সৎকর্ম ও বেদনিষিদ্ধ কর্ম অসৎকর্ম। বেদবিহিত যাগ্‌যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্তব্য কর্ম। ইহলোকে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলে পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তি কীভাবে ঘটে? মীমাংসকদের মতে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলে 'আত্মার একটি অদৃশ্য শক্তি উৎপন্ন হয় যার নাম "অপূর্ব" এবং এই শক্তি যথাসময়ে ফল প্রদান করে। যাগ্‌যজ্ঞ এবং তার ফলের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে অপূর্বকে স্বীকার করতে মীমাংসকরা বাধ্য হয়েছেন। যাগযজ্ঞ কতকগুলি অনুষ্ঠান ছাড়া কিছুই নয়। ফল উৎপন্ন হওয়া পর্যন্ত তারা স্থায়ী হয় না। অপূর্বকে স্বীকার করে না নিলে এই অনুষ্ঠান ও তার ফলের মধ্যে কার্যকরণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। কুমারিলের মতে, যজমান যে কর্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁর বলেই তাঁর নিত্য আত্মায় 'অপূর্ব' উৎপন্ন হয় এবং যতদিন পর্যন্ত না তিনি সেই অনুষ্ঠিত কর্মগুলির ফলভোগ করতে আরম্ভ করেন ততদিন পর্যন্ত এই 'অপূর্ব' স্থায়ী হয়। 'যজ্ঞ হল একটি কর্ম বা কর্ম পরম্পরা মাত্র'। যজ্ঞের ফল যে স্বর্গ, সেই স্বর্গ ফলের উৎপাদনকালে পর্যন্ত এ স্থায়ী হয় না। অন্যান্য দার্শনিকেরা কর্মবাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'সংস্কারের' উল্লেখ করেছেন। বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে পূর্ব বা অতীত জীবনের যেসব কর্ম সম্পাদিত হয় সেইসব কর্ম একপ্রকার শক্তি উৎপন্ন করে যাকে বলা হয় সংস্কার। সংস্কার হলো অতীত জীবনের অভিজ্ঞতার ছাপ। এই সংস্কারের জন্য জীবের পুনর্জন্ম হয়ে থাকে।

নিষ্কাম কর্মের গুরুত্ব

সর্ব কর্মবাদী দার্শনিকেরা মোক্ষলাভের জন্য নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সকাম কর্মই বিষয়ানুরাগ এবং বন্ধন সৃষ্টি করে যার ফলে জীবের পুর্নজন্ম ঘটে। নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনে বিষয়ানুরাগের কোন সম্ভাবনা থাকে না এবং এর ফলে পুনর্জন্মেরও কোন সম্ভাবনা থাকে না। কোন কোন বৌদ্ধ দার্শনিকের মতে নির্বাণ নিষ্ক্রিয় অবস্থা নয় এবং নির্বাণ লাভের পর যদি অনাসক্তভাবে কর্ম-সম্পাদন করা যায়। তাহলে বন্ধনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। মীমাংসা দার্শনিকদের মতে, কর্মের জন্যই কর্ম করতে হয়, কোন ফললাভের আশায় নয়। নিষ্কামভাবে বেদবিহিত নিত্যকর্ম সম্পাদনে স্বর্গসুখভোগ ঘটে। শঙ্কর কর্মবাদকে স্বীকার করে নিয়েছেন। ফল-কামনায় যে সব কর্ম করা হয় তারা কর্মবাদের নীতি অনুসারে ফলদান করে। অবিদ্যা থেকে কর্ম, কর্ম থেকে ব্যষ্টি জীবের সৃষ্টি। আমরা ক্রিয়া অনুরূপ কার্যের ফললাভ করি। যতদিন পর্যন্ত পূর্ণজ্ঞান না হয় জন্মান্তর ধরে এ চলতে থাকে।

শঙ্করের মত

কর্মদ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, শঙ্কর এই মত স্বীকার করেন না।মোক্ষ কর্মের প্রত্যক্ষ ফল নয়। কর্মফল অনিত্য, মোক্ষ নিত্য। কর্ম জ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ত করে। জ্ঞানলাভের পথে বা অন্তরায় তা দূর করতে কর্ম সাহায্য করে। পূর্ণজ্ঞান লাভ হলে কর্মের বীজ ধ্বংস হয় এবং পুনর্জন্মের রোধহয়। জীবের লক্ষ্য কর্মের অধীনতা থেকে মুক্তি লাভ করা । অবিদ্যা থেকে মুক্তি পেলে কর্ম থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। আসক্তি বর্জন করে এবং কর্মফল ঈশ্বরে উৎসর্গ করে যেসব কর্ম করা হয় সেগুলি চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়। কৈবলাদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে, যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভেদজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। ভেদজ্ঞান বন্ধনের কারণ। কেবলমাত্র ব্রহ্মই সত্য এবং জীবাত্মা ও বৃক্ষের অভেদত্ব জ্ঞানই মুক্তি আনয়ন করতে পারে।

রামানুজের মত

রামানুজের মতে, কর্মফলভোগ হেতু জীবের বদ্ধদশা। নিজ নিজ কর্মানুযায়ী প্রতিটি জীব একটি জড়দেহধারণ করে। আত্মার বদ্ধদশা মানেই হল আত্মার দেহধারণ করে। অবিদ্যাপ্রসূত কর্মই বদ্ধদশার কারণ। আত্মার অনাত্মার সঙ্গে একাত্মবোধের নাম অহঙ্কার। এই অহঙ্কারই অবিদ্যা। বেদান্ত পাঠের দ্বারা অবিদ্যা দূরীভূত হয়। তখন জীব উপলব্ধি করে যে, আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন এবং আত্মা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অংশ। কর্ম ও জ্ঞানের সংযোগেই মোক্ষলাভ সম্ভব। কর্ম অর্থ নিষ্কামভাবে বেদবিহিত কর্ম সম্পাদন এবং বেদান্ত পাঠের মাধ্যমে তত্ত্বজ্ঞান লাভ। বেদান্ত পাঠের মাধ্যমে মুমূক্ষ ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে, ব্রহ্মই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা এবং জীবাত্মা ও দেহ অভিন্ন নয়। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই জীবের মুক্তির হেতু। ঈশ্বরের করুণা ছাড়া মোক্ষ লাভ সম্ভব নয়।

কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ

কর্মবাদের সঙ্গে জন্মান্তরবাদ জড়িত। জন্মান্তরবাদ অনুসারে মৃত্যুর পরে আত্মার পুনর্জন্ম হয়, আত্মা তখন নতুন একটি দেহধারণ করে। কর্ম এবং তার ফলভোগের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। বর্তমান জীবনের কৃতকর্মের ফলভোগ যদি বর্তমান জীবন না হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, কর্মফল ভোগের জন্য আত্মাকে আবার দেহধারণ করে সংসারে আসতে হবে। কেননা কর্মের ফল বিনষ্ট হয় না এবং কর্মফলের নৈতিক মূল্য, তা শুভ বা অশুভ যাই হোক না কেন, সংরক্ষিত থাকে। কৃতকর্মের ফলভোগ করার জন্য জন্মের পর জন্ম হতে থাকে। একমাত্র সকাম কর্মের ফলভোগের জন্যই পুনর্জন্মের প্রয়োজন হয়। নিষ্কাম কর্ম করলে পুনর্জন্ম হয় না, যদি অবশ্যই ইতোমধ্যে পূর্বকৃত কর্মের ফলভোগ হয়ে থাকে। নিষ্কাম কর্ম এই সংসার যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায়। সকাম কর্ম মানুষকে বেঁধে রাখে, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম মানুষকে মুক্তি দেয়। ধার্মিক ব্যক্তিকেও অনেক সময় দুঃখভোগ করতে দেখা যায়, আবার পাপীকে দেখা যায় সুখভোগ করতে। এসব ব্যক্তির বর্তমান জীবনের কর্মাদির দ্বারা এদের এরূপ ফলভোগের ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই এসব ঘটনার ব্যাখ্যা করতে হলে জন্মান্তরবাদ অবশ্যস্বীকার্য। ধার্মিক ব্যক্তি যদি এ জীবনে দুঃখভোগ করেন তবে তিনি পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করেছেন। পাপী সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। কর্মবাদের সাহায্যে ভারতীয় দার্শনিকগণ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে একসূত্রে গ্রথিত করেছেন। অতীত বর্তমানের গোড়াপত্তন করেছে এবং বর্তমান ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ভগবদ্গীতায় জন্মান্তরকে নতুন বস্ত্র পরিধানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও তেমন পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহ আশ্রয় করে। এই হল জন্মান্তর। সংসার মানে জন্ম-জন্মান্তর। বৌদ্ধ দর্শনে একেই বলা হয়েছে ভবচক্র। বৌদ্ধদর্শন কোন সনাতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও বৌদ্ধ দর্শন কর্মবাদ বিশ্বাস করে এবং কর্মফল ভোগের জন্য জীবকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে

হয়– একথাও বৌদ্ধ দর্শনে স্বীকৃত। বেদান্ত দর্শনও কর্মবাদে বিশ্বাসী অবশ্য বেদান্তমতে কর্মবাদের যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য নিত্য ও সনাতন আত্মার অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। জড়বাদী চার্বাক দর্শন কর্মবাদে কিংবা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী নয়। চার্বাক দর্শন ছাড়া অন্যান্য সব নাস্তিক ও আস্তিক দর্শনে কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ অর্থাৎ পুনর্জন্মবাদ স্বীকৃত হয়েছে। তবে প্রত্যেক কর্মই যদি পুর্বের কৃতকর্মের ফল হয় তবে প্রথম কর্মকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, এর উত্তরে ভারতীয় দার্শনিকগণ বলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম পূর্বকর্মের জন্য এবং এই প্রক্রিয়া অনাদি। তবে মোক্ষলাভ হলে এর সমাপ্তি ঘটে। কর্ম বলতে অনারব্ধ কর্ম অর্থাৎ যে কর্ম এখনও ফল প্রসব করেনি এবং আরব্ধ বা প্রারব্ধ কর্ম অর্থাৎ যে কর্ম ফলপ্রসব করতে শুরু করেছে, উভয়কেই বোঝায়। অনারব্ধ কর্মকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়–– প্রাক্তন বা সঞ্চিত কর্ম অর্থাৎ অতীত জীবনসংক্রান্ত কর্ম এবং ক্রিয়মাণ বা সঞ্চিয়মান কর্ম অর্থাৎ যে কর্ম বর্তমান জীবনে সঞ্চিত হচ্ছে। আমরা যে দেহ ইন্দ্রিয়াদি লাভ করেছি তা প্রারব্ধ কর্মের ফল। সঞ্চিত কর্ম যেন অপক্ক ফল, এখনও তা ভোগের যোগ্য হয়নি। প্রারব্ধ কর্ম পরিপক্ক ফল, তা ভোগের উপযুক্ত হয়েছে। ইহজন্মের যা প্রারব্ধ কর্ম তা ভোগ করতেই হবে। ভোগ ভিন্ন তার ক্ষয় হবে না। অপরপক্ষে, ক্রিয়মাণ যে কর্ম তাকে বর্তমান কর্ম বলা হয়। মানুষ ইহজন্মে অনেক কর্ম করছে। বহুসংখ্যক ভাবনা, বাসনা, চেষ্টার সে কর্তা। এ সবই তার ক্রিয়মাণ পূর্বজন্ম, সেসব জন্মেও আমরা নানা কর্মের অনুষ্ঠান করেছি। সেই আমরাই আবার ইহজন্মে কর্ম করছি। অতএব যে জীব ক্রিয়মাণ কর্মের কর্তা সেই জীবই ওইসব পূর্ব জন্মকৃত কর্ম অর্থাৎ প্রাক্তন কর্মের কর্তা। আমাদের পূর্বজন্মে কৃত কিংবা ইহজন্মে ক্রিয়মাণ কর্ম হয় শুভ, না হয় অশুভ। কর্ম করলেই তার ফলভোগ করতেই হবে। এক জন্ম কেন, বহু জন্ম বয়ে গেলেও যতক্ষণ না কৃতকর্মের ফলভোগ হচ্ছে ততক্ষণ সেই কর্মের ক্ষয় নেই। যে জন্মে যে কর্ম করা হয়েছে তার অল্প অংশই সেই জন্মে ভোগের দ্বারা ক্ষয় হয়। অধিকাংশ কর্মই পরজন্মে ভোগের জন্য 'সঞ্চিত' হয়ে থাকে। এই অভুক্ত প্রাক্তন কর্মকে সঞ্চিত কর্ম বলে।

ষড় দর্শন মতে কর্ম

কর্ম-নিয়ম স্বাধীন, না ঈশ্বরাধীন, এই প্রশ্ন নিয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ন্যায় এবং বৈশেষিক দার্শনিকগণ কর্ম-নিয়মকে ঈশ্বরাধীন বলেছেন; তাঁদের মতে, জীবের অদৃষ্ট হলো তার কর্মের শুভাশুভ ফলের সমষ্টি অর্থাৎ শুভাশুভ ফলের ভাণ্ডারখানা। ভাণ্ডারখানায় যেমন ভাণ্ডারী দরকার, তেমনি এই জড় ও অচেতন অদৃষ্টকে পরিচালনার জন্য এক সচেতন সত্তাই হলেন ঈশ্বর। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই জীবের অদৃষ্টে শুভাশুভ কর্মফল যেভাবে একের পর এক সঞ্চিত হয়েছে সেভাবে জীবকে পর্যায়ক্রমে প্রদান করেন। অপরপক্ষে, সাংখ্য, মীমাংসা, জৈন ও বৌদ্ধ দার্শনিকগণ কর্মনিয়মকে স্বাধীন, ঈশ্বর নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র বলে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে এই নিয়ম ঈশ্বরের সহায়তা ছাড়াই স্বাধীন, স্বয়ংক্রিয়াশীল ও অন্যনিরপেক্ষ শক্তিরূপে জাগতিক সমগ্র ব্যাপারকেই নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। জৈন ও বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু এই কর্ম নিয়মের অনুশাসনকে মানেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে এই কর্ম-নিয়মের উপর ভিত্তি করেই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কর্ম-নিয়ম স্বাধীন বা ঈশ্বরাধীন যাই হোক না কেন, এই নিয়মের গণ্ডি (কার্যকারিতা) যে সকাম কর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এতে ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।

ন্যায় মতে কর্ম

ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহর্ষি গৌতম। তাঁর আর এক নাম ছিল অক্ষপাদ। তাই ন্যায় দর্শনকে অক্ষপাদ দর্শন বলা হয়। ন্যায় মতে আত্মা হলো দ্রব্য এবং এই দ্রব্যকে আশ্রয় করেই চেতনা থাকে। আত্মা হলো জ্ঞাতা, কর্তা এবং ভোক্তা। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন সবগুলিই আত্মার কারণ। যেগুলি আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আত্মা দেহ, বুহ্য-ইন্দ্রিয় এবং মনের অতিরিক্ত এক স্বতন্ত্র সত্তা। চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক বা অবিচ্ছেদ্য গুণ নয়। আত্মা স্বরূপত অচেতন ও নিষ্ক্রিয়। আত্মা যখন মনের সঙ্গে, মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয় বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়, তখন আত্মার চেতনার আবির্ভাব ঘটে। নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ আত্মা তখনই সগুণ ও সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং আত্মা জ্ঞাতা, ভোক্তা ও কর্তারূপে সব কিছু জানে, সকল কর্ম সম্পাদন করে এবং সকল কিছু ভোগ করে। আত্মা স্বরূপত অচেতন দ্রব্য এবং মোক্ষ অবস্থায় আত্মা নিজ স্বরূপে অবস্থান করে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনমতে, জীবের কর্মজাত পাপ-পুণ্য সঞ্চিত থাকে অদৃষ্টের মধ্যে। এই অদৃষ্টশক্তি অচেতন। সেজন্য সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এই অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং অদৃষ্টানুযায়ী জীবকে যথাসময়ে তার কর্মফল দান করেন। কিন্তু ন্যায়বৈশেষিক ও অন্যান্য দর্শনের মতে ঈশ্বর কর্মবাদের নিয়ন্তা। ঈশ্বর অবশ্য আপন খেয়ালখুশিতে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন না। তিনি কর্মবাদ অনুসারে এমন একটি জগৎ সৃষ্টি করেন যেখানে জীব আপন কর্ম অনুযায়ী ফলভোগ করতে পারে। ন্যায়বৈশেষিকের মতে 'অদৃষ্ট' হচ্ছে একটি অন্ধ নিয়ম এবং তা ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া যথোপযুক্ত ফলদান করতে পারে না। বেদেও বরুণকে 'ঋত'র প্রভু বলা হয়েছে। যে নিয়মে বিশ্ব পরিচালিত হয় তার মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও শক্তিই কাজ করে। 'ঋত' ঈশ্বরের স্বরূপের প্রকাশক। কর্মবাদের ভিত্তিতে ভারতীয় দার্শনিকগণ এই জগতকে এক বিরাট নৈতিক রঙ্গমঞ্চ রূপে এবং বিভিন্ন জীবকে অভিনেতা-অভিনেত্রী রূপে কল্পনা করেছেন। অভিনেতা যেমন তার যোগ্যতা অনুযায়ী একটি-ভূমিকা লাভ করে এবং সেই ভূমিকায় যথাযোগ্য অভিনয় করে প্রশংসা অর্জন করে কিংবা খারাপ অভিনয় করে নিন্দার ভাগী হয়, জীবও সেরকম পূর্বজন্মের কর্ম-ফলানুযায়ী দেহধারণ করে যথাযোগ্য পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে এবং কৃতকর্মানুযায়ী সুখ বা দুঃখ ভোগ করে। এই জীবনে সুকৃতির ফলে জীবের উর্ধ্বগতি হয়, কুকাজের ফলে অধোগতি। সুতরাং জীব নিজেই তার ভাগ্যনিয়ন্তা। মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছা ব্যবহার করে নিষ্কাম কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে মুক্তিলাভ করতে পারে। জীবের ভবিষ্যৎ জীবেরই অধীন। ভারতীয় দর্শনে যেভাবে কর্মবাদ ব্যাখ্যাত হয়েছে তাতে পুরুষকারের প্রচুর অবকাশ রয়েছে এবং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বর্তমান জন্মে মানুষ স্বেচ্ছায় সৎকর্মে নিযুক্ত হয়ে ভাবী জীবনের উন্নতিবিধান সুনিশ্চিত করতে পারে। দৈব (fate) তো কৃতকর্মের ফলমাত্র। আপন কর্মশক্তির অতিরিক্ত কোন শক্তিকে দৈব বলা যায় না। কাজেই কর্মবাদের মধ্যে পুরষকার ও দৈবের সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। কর্মবাদ নিয়ন্ত্রণবাদ বা অদৃষ্টবাদ নয়। কর্মবাদ হল স্বনিয়ন্ত্রণ। শুধু স্বনিয়ন্ত্রণ নয়, কর্মবাদ একদিকে যেমন অনিয়ন্ত্রণবাদের বিরোধী, অপরদিকে তেমনই ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বীকার করে নেওয়ার ফলে জীবের নৈতিক দায়িত্বও খণ্ডিত হয়নি। মানুষের জীবনে ও আচরণে কর্মবাদের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ ও মুল্যবান জিনিস আর নেই। ইহজন্মে আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটে তা বিনম্রতার সাথে গ্রহণ করা বিধেয়, কেননা এগুলো আমাদেরই অতীত কর্মের ফল। তবু ভবিষ্যৎ আমাদের অধীন এবং আমরা আশা ও বিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে পারি। কর্মবাদ ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদ এবং অতীতের কাজে বিনতি স্বীকারে

প্রণোদিত করে। কর্মবাদের জন্যই মানুষ অনুভব করতে পারে যে, জাগতিক জিনিস, জগতের ঐশ্বর্য ও বঞ্চনা কোন কিছুই মানুষের আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না।

বৈশেষিক মতে কর্ম

বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহর্ষি কণাদ। মহর্ষি কণাদের প্রকৃত নাম ছিল উলুক। কথিত আছে যে, এই মহান ঋষি শস্যকণার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন তাই তিনি কণাদ নামে অভিহিত হয়েছেন। বৈশেষিক দর্শনের মূল গ্রন্থের নাম 'বৈশেষিক সূত্র' বৈশেষিক মতাবলম্বীদের মতে, আত্মা সম্পর্কীয় ধারণা নৈয়ায়িকদেওর ধারণার অনুরূপ। আত্মা হলো এক শাশ্বত এবং সর্বব্যাপী দ্রব্য। আত্মা হলো জ্ঞান বা চেতনার আশ্রয়। আত্মা বিভু হলেও শরীর-ভেদ ভিন্ন ভিন্ন। আত্মা নিত্য, আত্মার কোন বিনাশ নেই। মহর্ষি কণাদ কর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, কর্ম হলো, যা দ্রব্য অবস্থান করে, অথচ গুণ নয়, এবং যা দ্রব্যের সংযোগ ও বিভাগের প্রত্যক্ষ করেন। আবার সর্বপ্রকার দ্রব্যের কর্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। যেমন, মনের কর্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কারণ হলো মন প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য নয়। সুতরাং যে সকল দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তাদের কর্মকেও প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন: ক্ষিতি, অপ, তেজ প্রভৃতি দ্রব্যের কর্মকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। আত্মাঅচেতন, কিন্তু দেহের সংস্পর্শে এসেই আত্মা চেতনা লাভ করে। যেহেতু আত্মা স্বরূপতঃ র্নিগুণ ও নিষ্ক্রিয়, সেই কারণে চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয়, আগন্তক গুণ। বৈদান্তিকদের মতে আত্মা এক। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন মতে জীবাত্মা বহু, কেননা যদি জীবাত্মা এক হত তাহলে একের সুখে সকলেই সুখ এবং একের দুঃখে সকলেই দুঃখ বোধ করত।

মীমাংসাকদের কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা

মহর্ষি 'জৈমিনি' মীমাংসা দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুসারে এই দর্শনের আর এক নাম 'জৈমিনি দর্শন'। মীমাংসা দার্শনিকগণ বেদের কর্মকাণ্ডের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার কিছু বিশেষত্ব আছে। প্রাচীন মীমাংসাকদের মতে স্বর্গ লাভই জীবের পরমার্থ। স্বর্গ অনন্ত সুখের আলয়। বেদবিহিত যাগ্যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বর্গ ও অমৃতত্ব লাভ হয়। যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানই জীবের একমাত্র ধর্ম, কারণ তাই হলো বেদের আজ্ঞা। বেদ নিত্য, স্বতঃপ্রমাণ এবং অপৌরুষেয়-'কর্ম' তার বাহ্য অভিব্যক্তি, কর্ম তার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। বেদবিহিত কর্মই জীবের একমাত্র লক্ষ্য। পূর্ব-মীমাংসা বিশ্বাস করে যে, কর্ম সর্বশক্তিমান এবং কেউ কর্মের শক্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কর্ম-অনুষ্ঠানের পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য নিহিত থাকে তাই কর্মের স্বরূপ নির্ধারণ করে-সেই-কর্ম হিংসাত্মক বা অহিংসাত্মক যাই হোক না কেন। এই কারণে বেদবিহিতযজ্ঞে পশুবধ হিংসাত্মককার্য হলে ও অধর্ম বিবেচিত হয়না। কারণ, যজ্ঞ হলো পুরুষার্থ এবং পশুটিকে যজ্ঞেই উৎসর্গ করা হচ্ছে। মীমাংসা মতে কর্ম বেদবিহিত, কোন ঈশ্বরের আদেশ নয়। বৈদিক বিধি অনুযায়ী কর্ম করাই ধর্ম এবং তাই হলো জীবের পক্ষে সৎ কর্ম এবং কর্তব্য কর্ম। মীমাংসা শাস্ত্রে কোথাও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নেই। দেবতাকে স্বীকার করা হলেও দেবতা 'মন্ত্রাত্মক'। দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয় মাত্র। মীমাসংকদের মতে যাগ্যজ্ঞ বেদবিহিত-এই মনে করেই যাগ্যজ্ঞ করতে হবে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি বা পুরষ্কারের লোভে নয়।

সাংখ্য মতে কর্ম

সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা হলেন 'মহর্ষি কপিল'। ভারতীয় দর্শনগুলোর মধ্যে সাংখ্য দর্শনই প্রাচীনতম। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সাংখ্য দর্শনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে জানা যায়। সাংখ্য দর্শনের আদি গ্রন্থ মহর্ষি কপিল প্রণীত "তত্ত্বসমাস" এই গ্রন্থে সাংখ্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া

যায়। সাংখ্য মতে মূলতত্ত্ব এক ব্রহ্ম নয়, মূলতত্ত্ব দুটি–পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদি ও নিত্য। প্রকৃতি জড়, ত্রিগুণময়ী, পরিণামী, বিকারশীল,প্রসবধর্মিণী বা সৃষ্টিক্ষম। পুরুষ চেতন, নির্গুণ, অপরিণামী, অসঙ্গ, অর্কতা, উদাসীন সাক্ষী মাত্র। প্রকৃতি দৃশ্য, পুরুষ প্রকৃতির সংযোগই সৃষ্টি। এই সংসার দুঃখময়। সাংখ্য মতে পুরুষ প্রকৃতির অবিবেক, অর্থাৎ অভেদ জ্ঞানই জীবের বন্ধনের কারণ। বিবেকখ্যাতি অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্য জ্ঞানই মুক্তি। এই জ্ঞানই দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। বিবেকজ্ঞান লাভ করার একটি উপায় হলো তত্ত্বাভ্যাস। এই তত্ত্বাভ্যাসের ফলে 'আমি পুরুষ', আমি পরিণামীই, আমার কর্তৃত্ব নেই', 'আমার স্বামিত্ব নেই',- এই বিশুদ্ধ কেবলতত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। কাজেই বিবেকখ্যাতি দুঃখ হননের এবং কৈবল্য লাভের উপায়। আত্মা বা শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা, দেহ মন-বুদ্ধি অহঙ্কার থেকে পৃথক-এই প্রখ্যাত জ্ঞানই বিবেকখ্যাতি। সাংখ্য মতে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ বিনষ্ট হলে, পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করলে প্রকৃতির ক্রিয়া বন্ধ হয়। সাংখ্য মতে মোক্ষ অর্থে কর্মের শেষ। সাংখ্য দর্শন মতে, কর্মবাদ একটি স্বাধীন ও নৈর্ব্যক্তিক নিয়ম, যা ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকেই জীবের কর্মানুসারে ফলদান করে, এবং বাহ্য জগৎকে নৈতিক জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে। সাংখ্য দর্শন মতে, ঈশ্বর কর্মবাদের নিয়ন্তা। ঈশ্বর আপন খেয়ালখুশিতে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন না। তিনি কর্মবাদ অনুসারে এমন একটি জগৎ সৃষ্টি করেন, যেখানে জীব আপন কর্মানুযায়ী ফলভোগ করতে পারে।

যোগদর্শন মতে কর্ম

মহর্ষি পতঞ্জলি 'যোগ দর্শনের', প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা। 'পতঞ্জলির নামানুসারে যোগ দর্শনের আদি গ্রন্থ হলো যোগসূত্র বা পতঞ্জলি সূত্র। যোগদর্শন মতে পুরুষের আত্মস্বররূপে অবস্থানই কৈবল্য। যোগ দর্শনমতে, বিবেক খ্যাতিই দুঃখ হানির এবং কৈবল্য লাভের উপায়। বিবেক খ্যাতির অর্থ হলো আত্মা যে শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা এবং আত্মা যে দেহ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার থেকে পৃথক এই প্রখ্যাত জ্ঞান লাভ করা যায় না। অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্টানে চিত্তশুদ্ধি ঘটে এবং বিবেকখ্যাতি জাগে, যার ফলে কৈবল্য লাভ ঘটে। এই অষ্ট অঙ্গ হলো-যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। অদ্বৈত বেদান্তমতে মোক্ষাবস্থা এক আনন্দঘন অবস্থা। কর্মবাদে কর্মতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা করেছেন ভাষ্যকার স্বামী ভর্গানন্দ। এতে সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় জন্ম-মৃত্যুও এসে গেছে। কর্ম, কর্মফল, তার জন্য পুরুষের জন্ম, তার আয়ুষ্কাল ও তার ভোগও আলোচিত। তিনি বলছেন, চিত্তভূমিতে অবিদ্যাদি ক্লেশকর্ম থাকা জনিত যে কর্মফল, সেই কর্মফলের জন্য পুরুষের জন্ম, তার আয়ুষ্কাল ও তার ভোগও নির্ধারিত। এই তিনের কারণই হলো, পুরুষের পূর্ব জন্মার্জিত কর্মাশয় বা কর্মসংস্কার ও বর্তমান কর্মাশয়। কারণ না থাকলে কোন কার্য ঘটে না। সুতরাং কর্মজনিত সংস্কারই জন্ম, আয়ু ও ভোগের কারণ।

কর্ম সম্পর্কে অদ্বৈত বেদান্ত মত

ষড়দর্শনের মধ্যে মীমাংসা দর্শন (পূর্ব-মীমাংসা) কর্মবাদী, অন্যান্যগুলি জ্ঞানবাদী। অদ্বৈতবেদান্ত মতে আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ। আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। তবে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আত্মা বহু, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে আত্মার বহুত্ব স্বীকৃত নয়; আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। অদ্বৈতাবেদান্ত মতে আত্মার কোনো অংশ নাই, আত্মা নিরবয়ব। অদ্বৈতবেদান্ত দার্শনিকেরা আত্মাকেই ব্রহ্ম বলেছেন এবং তাদের মতে এই ব্রহ্ম সত্য, আর সবই মিথ্যা। আত্মা নিত্য, নির্বিশেষ, অনাদি ও অনন্ত।

শঙ্কর বলেন, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় মানুষ দেহ ও আত্মার সমষ্টি। কিন্তু আসলে তা নয়। মানুষের দেহ অন্যান্য জড়বস্তুর ন্যায় মিথ্যা। কেবল আত্মাই সৎবস্তু, দেহ সৎবস্তু নয়। শঙ্করের মতে, উপনিষদের "তত্ত্বমসি" বাক্যের

অর্থ তাই। 'তৎ' অর্থাৎ 'সেই' শব্দের দ্বারা ব্রহ্মকেই বুঝায় এবং 'ত্বম' অর্থাৎ 'তুমি' শব্দের দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মাকেই বুঝায়। সুতরাং আত্মা এবং ব্রহ্ম এক।

বৌদ্ধ মতে কর্ম

বৌদ্ধ ধর্মের, প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধের বাণী ও উপদেশের উপর ভিত্তি করে জগত ও জীবন সম্পর্কে যে মতবাদ গড়ে উঠেছে সেই মতবাদই বৌদ্ধ দর্শন বা বৌদ্ধ ধর্ম। অভিজ্ঞতাবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকগণও কোন শাশ্বত বা চিরন্তন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কোন এক মুহূর্তে আমাদের মধ্যে আমরা যেসব মানসিক কোন শাশ্বত বা চিরন্তন সত্তার অস্তিত্ব থাকে না। মানুষের মধ্যে কোন অপরিবর্তনীয় সত্তার অস্তিত্ব না থাকলেও, মানুষের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে, তারই দ্বারা ব্যক্তি-অভিন্নতা ব্যাখ্যা এবং তাঁর মতে, জন্মান্তর অর্থে কোন চিরন্তন আত্মার নতুন দেহ পরিগ্রহণ হয়। জন্মান্তর অর্থে বর্তমান জীবন থেকে পরবর্তী জীবনের উদ্ভব। জীব হলো মানসিক প্রক্রিয়ার প্রবাহ। এই মানসিক প্রক্রিয়াই এক জন্ম থেকে আর এক জন্মে প্রবাহিত হয়। মানুষ পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি। এই পঞ্চস্কন্ধ হল-রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান। বুদ্ধদেবের মতে, যারা শাশ্বত অখণ্ড আত্মার কথা বলেন তাঁরা মূলতঃ পঞ্চস্কন্ধের একত্রে বা কোন একটিকে প্রত্যক্ষ করে শাশ্বত আত্মার কথা বলে থাকেন। বৌদ্ধ দর্শন কোন সনাতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও বৌদ্ধ দর্শন কর্মবাদে বিশ্বাস করে। কর্মফল ভোগের জন্য প্রত্যেক জীবকে পূনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়– একথাও বৌদ্ধ দর্শনে স্বীকৃত। তাই বৌদ্ধ দর্শন কর্মবাদে বিশ্বাসী।

জৈন দর্শনে কর্মবাদ

জৈন দর্শন অতি প্রাচীন দর্শন। জৈন শব্দের উৎপত্তি 'জিন' শব্দ থেকে। এই'জিন' শব্দের অর্থ হল 'জয়ী'। জৈন তীর্থঙ্করগণকে'জিন' নামে অভিহিত করা হয়। কারণ তাঁরা রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি রিপুগুলিকে জয় করেছিলেন। চব্বিশজন তীর্থঙ্কর (শাস্ত্রকার) জৈন দর্শনের প্রচারক। জৈন দর্শনেও কর্মবাদের আলোচনা দেখা যায়। জৈন দর্শন মতেও সকাম কর্মের জন্য আত্মার দেহধারণ এবং কর্মফল ভোগের জন্যই জীবের পুনর্জন্মগ্রহণ। কামনা,বাসনা ও ভোগ-লালসার বিরতি ঘটলেই জীব মুক্তিলাভ করে। জৈনগণের মতে কর্মই বন্ধনের কারণ। কর্ম আট প্রকার– (১) জ্ঞানাবরণীয় কর্ম, অর্থাৎ যে কর্ম আত্মার যথার্থ জ্ঞানকে আবৃত করে। (২) দর্শনাবরণীয় কর্ম, –যে কর্ম সম্যক দৃষ্টিকে ব্যাহত করে। (৩) মোহনীয় কর্ম–যে কর্ম মোহের সৃষ্টি কওে জীবকে অশুভ কর্মসাধনে প্রযুক্ত করে। (৪) বেদনীয় কর্ম–যে কর্ম সুখ–দুঃখের অনুভূতি সৃষ্টি নির্ভও করে। (৫) নাম কর্ম–যে কর্মের উপর দেহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিও সৃষ্টি নির্ভর করে। (৬) অন্তরায় কর্ম অর্থাৎ যে কর্ম অন্তরায় সৃষ্টি ক'রে জীবের শুভকর্ম সম্পাদনে বাধা প্রদান করে। (৭) গোত্র কর্ম অর্থাৎ যে কর্ম বংশ নিরুপণ করে। (৮) আয়ুষ কর্ম অর্থাৎ যে কর্ম জীবের আয়ুষ্কাল নির্ধারণ করে। জৈন মতে কর্ম দুপ্রকার-ভাব কর্ম ও দ্রব্য কর্ম। ভাবকর্ম হল কুভাবনা, দ্রব্য কর্ম হল যা পুদগলের পরমাণুগুলিকে আত্মার দিকে আকর্ষণ করে আত্মার কার্মন শরীর গঠন করে। আত্মার আবরণ কর্ম, কর্মের আবরণ দেহ।

চার্বাক মতে কর্ম

জড়বাদী চার্বাক দার্শনিকরা দেহাতিরিক্ত কোন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। চার্বাকদের মতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। 'আমি রুগ্ন', 'আমি অন্ধ', 'আমি স্থুল', প্রভৃতি উক্তিই স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, দেহ ও আত্মা সমার্থক। চার্বাক মতে, চৈতন্য কোন অতিমানস সনাতন আত্মার গুণ নয়, চৈতন্য দেহেরই গুণ। ক্ষিতি, অপ্,

তেজ:, মরুৎ, ও ব্যোম এই পাঁচটি মহাভূতের বিশেষ সংমিশ্রণে যখন জীবদেহের উৎপত্তি ঘটে, তখন সেই দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে। প্রশ্ন হল, যে পাঁচটি মহাভূতের দ্বারা জীবদেহ ঘটিত, তাদের কোনটিই যখন চৈতন্য ধর্ম বিশিষ্ট নয়, তখন তাদের সংমিশ্রণে জীবদেহের চৈতন্যের আর্বিভাব কীভাবে ঘটতে পারে? এর উত্তরে চার্বাকরা বলেন যে–পান, চুন ও সুপারি –এই তিনটির কোনটির মধ্যেই কোন লাল আভা নেই, তবু এদের একত্রে চর্বণ করলে একটি লাল আভা দেখা যায়। অনুরূপভাবে পাঁচটি মহাভূতের কোনটিই চৈতন্যধর্মবিশিষ্ট না হলেও এগুলোর বিশেষ সংমিশ্রণে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটতে পারে। চৈতন্য জড়ের উপবস্তু। যেহেতু দেহাতিরিক্ত কোন চৈতন্যের অস্তিত্ব নেই, সেহেতু আত্মার বিনাশের প্রশ্ন অবান্তর। দেহের বিনাশেই জীবনের পরিসমাপ্তি। আত্মার অমরতা, কর্ম-ফলভোগ, জন্মান্তর, বন্ধন, মুক্তি সবই অর্থহীন। চার্বাক মতে, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষের মাধ্যমে কোন অজড় নিত্য চৈতন্যবিশিষ্ট আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যেতে পারে না।

উপসংহার

ভারতীয় দর্শন নৈতিক কর্মবিমুখতার দর্শন নয়। যদিও ভারতীয় দর্শন অবিদ্যা ও অজ্ঞানতাকেই সর্বপ্রকার দুঃখের মূল বলে স্বীকার করে এবং যথার্থ জ্ঞানকেই মোক্ষলাভের পরিপূরক মনে করে, তবু প্রায় সকল ভারতীয় দর্শনেই নৈতিক ও সামাজিক কর্ম-সম্পাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চিত্তের শুদ্ধতা, ইন্দ্রিয় সংযম, সৎকর্ম সম্পাদন, সত্যনিষ্ঠা, অহিংসা, ভোগ বিমুখতা-সংক্ষেপে নৈতিক জীবন-যাপনের উপরই জীবের মোক্ষলাভ একান্তভাবে নির্ভর। যদিও মোক্ষই ভারতীয় দর্শনে পুরুষার্থ, তবু চতুর্বর্গের অপর তিনটি-ধর্ম, অর্থ ও কামকে ভারতীয় দর্শন উপেক্ষা করেনি। দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণের মতে, ভারতীয় দর্শনে ধর্মের ধারণা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ধারণা। নৈতিক পূর্ণতা ঈশ্বর জ্ঞানের প্রথম স্তর। কর্মমাত্রই দোষযুক্ত বা বন্ধনের কারণ। কর্মফলে দেহধারণ, আবার দেহধারণ হলেই কর্ম। এই জন্ম-কর্মচক্রের নিবৃত্তি নেই। কাজেই কীভাবে জীব এই কর্মচক্র থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে? জ্ঞানবাদীরা বলেন, আত্মজ্ঞান ভিন্ন কর্মবন্ধন থেকেই মুক্তিলাভ করা যায় না। কেউ কেউ আত্মা-অনাত্মা বিচার দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকারের কথা বলেন। অনেকের মতে মোক্ষলাভের জন্য যে সব পথ স্বীকৃত তার মধ্যে জ্ঞানের পথ সবচেয়ে কঠিন। বস্তুতঃ অন্যান্য পথগুলি অতিক্রম করে এলেই মুমুক্ষু ব্যক্তি এই পথ অনুসরণের সামর্থ্য অর্জন করে। তবে এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করলে ভুল হবে যে, অন্যান্য মোক্ষমার্গের সঙ্গে জ্ঞানমার্গের বিরোধিতা বর্তমান। বরং একথা বলা যেতে পারে যে, এই পথ সকলের জন্য নয়, সীমিত স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির জন্য যারা জ্ঞান ও বুদ্ধির এক উচ্চস্তরে উন্নীত। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন কিছুদিনের জন্য ধ্যানমার্গ, কর্মমার্গ ও ভক্তিমার্গের অনুসরণ করা। এই কারণেই বলা হয় জ্ঞানমার্গ সব মার্গের শ্রেষ্ঠ মার্গ এবং সমস্ত কর্মের পরিসমাপ্তি জ্ঞানে।

তথ্যসূত্র

অর্জুন বিকাশ চৌধুরী। *ভারতীয় দর্শন*। কলকাতা: ২০১৩-২০১৪।
জগদীশ্বর সান্যাল। *ভারতীয় দর্শন*। কলকাতা: ২০০৭।
প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত। *ভারতীয় দর্শন*। কলকাতা: ২০০৩-২০০৪।
স্বামী ভর্গানন্দ। *পাতঞ্জল যোগদর্শন*। কলকাতা: ২০১৫।
স্বামী রামসুখদাস। *কর্ম রহস্য*। কলকাতা।